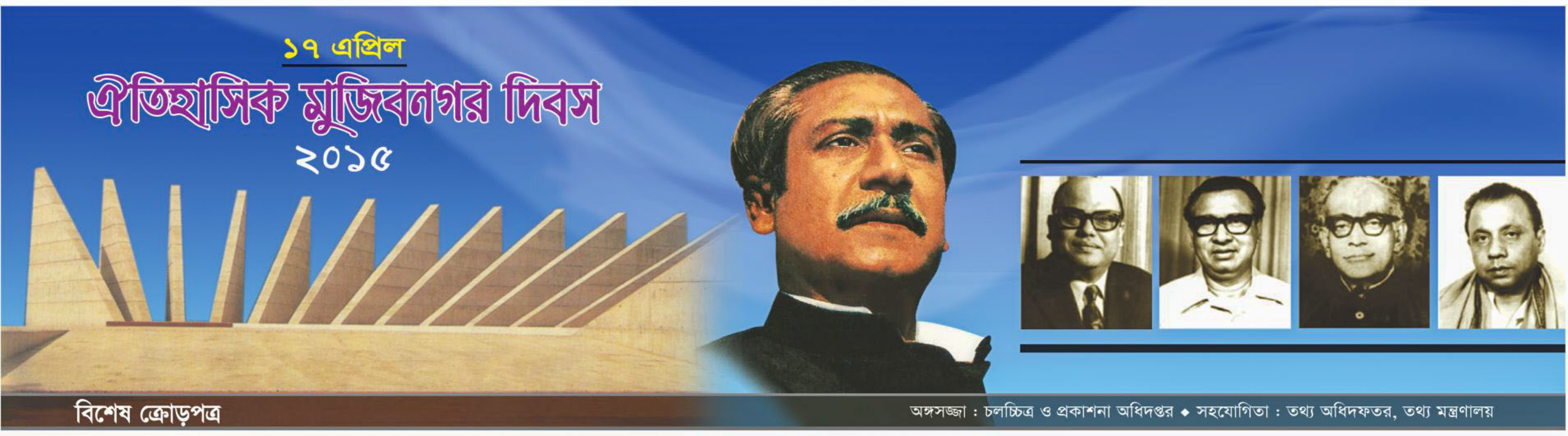

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস'। দিবসটি উপলক্ষে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমি এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে যাঁদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়েছিল। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক-সংগঠকসহ সকল স্তরের জনগণকে যাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অবদান রেখেছেন। আমি শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ২৬ মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার শপথ নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যাত্রা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাসহ বিশ্ব দরবারে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের সহায়তা, যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের পাশে দাঁড়ানোসহ মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় নবগঠিত এ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সফল পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাই মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুজিবনগর সরকার গঠনে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন আমি তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের নিকট সঠিকভাবে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস'-এ দেশের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার পাশাপাশি দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে জাতিগঠনমূলক কাজে অবদান রাখবে – এই প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাঙালি জাতির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে মুজিবনগরের নাম। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে দেশবাসী যখন মুক্তিসংগ্রামের জন্য উজ্জীবিত, তখনই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিপাগল নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাই বাঙালি জাতি এতে হতোদ্যম হয়নি। সারাদেশে গড়ে ওঠে সশস্ত্র প্রতিরোধ, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জাতীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরির মাধ্যমে গঠিত হয় ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় (যার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে।

মুজিবনগর সরকারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের মাধ্যমে এ সরকার বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধকে একটি সমন্বিত ও সুসংহত রূপ দেয়। ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের দিকনির্দেশনা ও বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম। নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকহানাদার বাহিনীর ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

জয়ের আনন্দ অনেকাংশে আমরা ভুলে গেলেও '৭১ এর পরাজিত শক্তি পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি। তাই আজও স্বাধীনতার মূল চেতনাকে খামচে ধরছে ঐ শকুনরা। ইতিহাস বিকৃতিসহ যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তারা। তাই স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা প্রতিহত করতে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে দিতে এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

আসুন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা, সফল রাষ্ট্রনায়ক, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হই। সুখী-সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি। মুজিবনগর সরকারের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে আবার গর্জে উঠি। মুজিবনগর দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রত্যয়।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আ ক ম মোজাম্মেল হক, এমপি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন:

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

[অনুবাদ: "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।

মুজিবনগর সরকার জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

(১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রি.)

"যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন, এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন, এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়, এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে, এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।"
[অনূদিত।]

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। পাশাপাশি এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ অনুমোদন করা হয়। সেদিন থেকে এ স্থানটি মুজিবনগর নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

স্বাধীনতার স্বপক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ এবং তদানীন্তন ইপিআরসহ সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রেখে এই সরকার দীর্ঘ নয় মাস দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিত্রশক্তির সহায়তায় চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে সমূলে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আড়াই মাসের ব্যবধানে ৩ নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ২১ বছর বাংলাদেশে গণতন্ত্র ছিল না। আইনের শাসন ও জনগণের অধিকার সামরিক স্বৈরাচারের বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছিল। ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে সরকার গঠনের পর দেশে আবারও ফিরে আসে গণতন্ত্র।

ঐতিহাসিক এ দিনে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ চার জাতীয় নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত মা-বোনদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

জাতির পিতার হত্যাকারীদের প্রচলিত আদালতে বিচার ও রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি দায়মুক্ত হয়েছে। জেলখানায় নিহত ৪ জাতীয় নেতার হত্যা মামলার পুনর্বিচারের কাজ চলছে। মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে সকল ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। গত ছয় বছরে দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বৈদেশিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল-মডেলে পরিণত করেছি।

বিএনপি-জামাত জোট যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত এবং বিএনপি নেত্রী ও তাঁর পরিবারকে দুর্নীতি মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য রাজনীতির নামে জঙ্গি স্টাইলে মানুষ পুড়িয়ে মারছে। দেশব্যাপী নাশকতা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। দেশের জনগণ তাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। স্বাধীনতার চেতনা ও উন্নয়নবিরোধী এ অপরাজনীতির বিরুদ্ধে জনগণ আজ একতাবদ্ধ।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আমি দেশবাসীকে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল এক গৌরবোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতম হামলার পর এ দেশের মানুষ খুব দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। একে একে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠলেও একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সমন্বিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। দেশের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত ও পরিচালনাই কেবল নয়, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে ন্যায়যুদ্ধ ও অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্যও একটি সরকার কাঠামোর প্রয়োজন ছিল। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল সরকার শপথ নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে বন্দি থাকলেও স্বাধীনতার এ মহান স্থপতি ও প্রাণপুরুষকেই বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান মন্ত্রিসভার সদস্য হন। বঙ্গবন্ধুর নামে ও তাঁকে প্রেরণার কেন্দ্রে ধারণ করে জাতীয় এ চার নেতা দেশপ্রেমিক মুক্তিপাগল জনতাকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধকে একটি সফল জনযুদ্ধে পরিণত করেন। আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ে তাঁরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ফলে নয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলা এবং স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিনটি উৎসবমুখর পরিবেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করেছে। সব ধরনের বঞ্চনামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করব – আজকের দিনে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

এম এ হান্নান

মুক্তাঞ্চল মেহেরপুরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল যুগসন্ধিক্ষণ ১৯৭১-এ আমি সীমান্তবর্তী মহকুমা মেহেরপুরের প্রশাসক ছিলাম। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের সময় কৃষ্ণনগর থেকে কেটে এই ছোটো মহকুমাটির সৃষ্টি হয়, যা এখন একটি স্বতন্ত্র জেলা।

৭ মার্চ ১৯৭১। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমাবেশে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন। রৌদ্রস্নাত বসন্তের সেই বিকেলে অগণিত মানুষের জনসমুদ্রে কাকতালীয়ভাবে হলেও সরকারি কাজের সুবাদে উপস্থিতির সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিজীবী আমি, কিছুটা ভয়ে সন্তর্পণে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই সভার শ্রোতা হয়ে যাই। বঙ্গবন্ধু শেষ করলেন এক হৃদয় নিংড়ানো ডাক দিয়ে "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" নিজের অজান্তেই আমার স্বাধীনতাসংগ্রামের দীক্ষা হয়ে গেল।

মেহেরপুরে প্রত্যাবর্তনের পর আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষণে প্রচ্ছন্নভাবে যে সকল নির্দেশ ছিল তা অনুসরণ করে পদক্ষেপ নিতে থাকি।

পূর্বপাকিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আমরা কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজে একত্রিত হই। সিদ্ধান্ত হয়, আমরা নিজ নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

'অপারেশন সার্চ লাইট' পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা চালায় পাক সেনাবাহিনী। এ খবর সহসাই সারাদেশে পৌঁছে যায়। আমি সংবাদ পাই মেহেরপুর পুলিশ লাইনের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে। ২৫ মার্চ রাতেই মাইকে মেহেরপুর শহরের জনগণকে ঢাকায় পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা জানিয়ে দেওয়া হলো। সেই মধ্যরাতেই শহরের একমাত্র চৌরাস্তায় তাৎক্ষণিক জনসমাবেশ হয়, মুখ্যত তরুণদের অংশগ্রহণে। আমি একটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিই। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন কর্মকর্তা হয়েও জনগণের সংগ্রামের সাথে আমার একাত্মতা শুধু ঐ তরুণদেরই উৎসাহিত করেনি, সবার মনে সাহস যুগিয়েছে।

ঐ রাতেই মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা পাকা সড়কে গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করা হয় এবং মেহেরপুরকে চুয়াডাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া রাস্তায় খলিশাকুণ্ডী কাঠের পুল ভেঙে দেওয়া হয়।

২৬ মার্চ ভোরবেলা। মানুষের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। লাখো জনতা এক সম্মিলিত সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। সমগ্র পরিস্থিতি মূল্যায়নের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের কোনো জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দুটি চিঠি পাঠাই। প্রথম চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল নদীয়া জেলা প্রশাসক মি. মুখার্জীর কাছে, যার অনুলিপি পাঠানো হয় মেহেরপুর সংলগ্ন ভারতীয় সীমান্তে নিয়োজিত ৭৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সি.ও. লেফটেন্যান্ট কর্নেল চক্রবর্তীর কাছে। দ্বিতীয় চিঠিটি ভারতের জনগণকে উদ্দেশ্য করে পাঠাই। দুটোতেই আমি আমার স্বাক্ষর এবং মহকুমা প্রশাসকের সিলমোহর ব্যবহার করি।

এরপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণ পেয়ে ২৯ মার্চ আমি বেতাই বর্ডার পোস্টে উপস্থিত হই। নদীয়ার জেলা প্রশাসক আমাকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে অভিহিত করে মর্যাদা দেন। জেলা প্রশাসক এবং কর্নেল চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয়। এর পরেই খবর পাঠানো হয়, আমাদের সামরিক প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমি যেন ৩০ মার্চ চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে চেংখালী চেকপোস্টের অদূরে ভারতীয় বিওপিতে একজন সামরিক অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করি।

৩০ মার্চ সকালে আমি চুয়াডাঙ্গার তদানীন্তন ইপিআর-এর উইং কমান্ডার মেজর ওসমানের সঙ্গে আলোচনা করতে যাই। অল্প সময় পর ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব উদ